আল হাশর

৫৯

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ অংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে 'আল হাশর' শব্দের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবনে যুবাইরের দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য এরূপ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বলো যে, এটা সূরা নাযীর। মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এবং অন্যদের থেকেও একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাদের সবার ঐকমত্যভিত্তিক বর্ণনা হলো, এ সূরাতে যেসব আহলে কিতাবের বহিষ্কারের উল্লেখ আছে তারা বনী নাযীর গোত্রেরই লোক। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সূরাটিই বনী নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল ? এ সম্পর্কে ইমাম যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম এবং বালাযুরী একে হিজরী চতুর্থ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সঠিক মত। কারণ সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধ 'বি'রে মা'উনা'র দুঃখজনক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, 'বি'রে মা'উনা'র মর্মান্তিক ঘটনা ওহুদ যুদ্ধের পরে ঘটেছিল—আগে নয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরার বিষয়বস্তু ভালভাবে বুঝতে হলে মদীনা ও হিজাযের ইহুদীদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তা নাহলে নবী (সা) তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণসমূহ কি ছিল কেউ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে না।

www.icsbook.info

আরবের ইহুদীদের নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস দুনিয়ায় নেই। তারা নিজেরাও পুস্তক বা শিলালিপি আকারে এমন কোন লিখিত বিষয় রেখে যায়নি যা তাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করতে পারে। তাছাড়া আরবের বাইরের ইহুদী ঐতিহাসিক কিংবা লেখকগণও তাদের কোন উল্লেখ করেননি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়, আরব উপদ্বীপে এসে তারা তাদের স্বজাতির অন্য সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই দুনিয়ার ইহুদীরা তাদেরকে স্বজাতীয় লোক বলে মনেই করতো না। কারণ তারা ইহুদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। হিজাযের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মধ্যে যেসব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ইহুদীদের কোন নাম নিশানা বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে শুধুমাত্র কয়েকজন ইহুদীর নাম পাওয়া যায়। এ কারণে আরব ইহুদীদের ইতিহাসের বেশীর ভাগ আরবদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার ওপরে নির্ভরশীল। এরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদীদের নিজেদেরই প্রচারিত।

হিজাযের ইহুদীরা দাবী করতো যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবনকালের শেষদিকে সর্বপ্রথম এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এই কাহিনী বর্ণনা করে তারা বলতো, হযরত মূসা (আ) আমালেকাদের বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর একটি সেনাদলকে ইয়াসরিব অঞ্চল দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ জাতির কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত রাখা না হয়। বনী ইসরাঈলদের এই সেনাদল নবীর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করল। তবে, আমালেকাদের বাদশার একটি সুদর্শন যুবক ছেলে ছিল। তারা তাকে হত্যা করল না। বরং সাথে নিয়ে ফিলিস্তিনে ফিরে গেল। এর পূর্বেই হযরত মূসা (আ) ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন ঃ একজন আমালেকীকেও জীবিত রাখা নবীর নির্দেশ এবং মূসার শরীয়াতের বিধি-বিধানের স্পষ্ট লংঘন। তাই তারা উক্ত সেনাদলকে তাঁদের জামায়াত থেকে বহিষ্কার করে। বাধ্য হয়ে দলটিকে ইয়াসরিবে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে হয়। (কিতাবুল আগানী, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪) এভাবে ইহুদীরা যেন দাবী করছিল যে, খৃষ্টপূর্ব ১২শ' বছর পূর্বে থেকেই তারা এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্ভবত এ কাহিনী তারা এ জন্য গড়ে নিয়েছিল যাতে আরবের অধিবাসীদের কাছে তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ও অভিজাত হওয়া প্রমাণ করতে পারে।

ইহুদীদের নিজেদের বর্ণনা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সনে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আরেকবার এদেশে তাদের আগমন ঘটেছিল। এই সময় বাবেলের বাদশাহ 'বখতে নাস্‌সার' বায়তুল মাকদাস ধ্বংস করে ইহুদীদেরকে সারা পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। আরবের ইহুদীরা বলতো, সেই সময় আমাদের কিছু সংখ্যক গোত্র এসে ওয়াদিউল কুরা, তায়মা এবং ইয়াস্‌রিবে বসতি স্থাপন করেছিল। (ফুতূহুল বুলদান, আল বালাযুরী) কিন্তু এর পেছনেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অসম্ভব নয় যে, এর মাধ্যমেও তারা তাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রমাণিত তা হলো, ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমানরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ওপর গণহত্যা চালায় এবং ১৩২ খৃষ্টাব্দে এই ভূখণ্ড থেকে তাদের

www.icsbook.info

সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করে সেই সময় বহু সংখ্যক ইহুদী গোত্র পালিয়ে হিজাযে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা, এই এলাকা ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল সংলগ্ন। এখানে এসে তারা যেখানেই ঝর্ণা ও শ্যামল উর্বর স্থান পেয়েছে সেখানেই বসতি গড়ে তুলেছে এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র ও সুদী কারবারের মাধ্যমে সেসব এলাকা কুক্ষিগত করে ফেলেছে। আয়লা, সাকনা, তাবুক, তায়মা, ওয়াদিউল কুরা, ফাদাক এবং খায়বরের ওপরে এই সময়েই তাদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিলো। বনী কুরাইযা, বনী নাযীর, বনী বাহদাল এবং বনী কায়নুকাও এ সময়ই আসে এবং ইয়াসরিবের ওপর আধিপত্য কায়েম করে।

ইয়াসরিবে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তারা ইহুদী পুরোহিত (Cohens বা Priests) শ্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল। ইহুদীদের মধ্যে তাদের অভিজাত বলে মান্য করা হতো এবং স্বজাতির মধ্যে তারা ধর্মীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এরা যে সময় মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করে তখন কিছু সংখ্যক আরব গোত্রও এখানে বসবাস করতো। ইহুদীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কার্যত শস্য–শ্যামল উর্বর এই ভূখণ্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসে। এর প্রায় তিন শ' বছর পরে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ামানে সেই মহাপ্লাবন আসে সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে যার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্লাবনের কারণে সাবা কওমের বিভিন্ন গোত্র ইয়ামান ছেড়ে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এদের মধ্য থেকে গাস্সানীরা সিরিয়ায়, লাখামীরা হীরায় (ইরাক), বনী খুযা'আ জিদ্দা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ইহুদীরা যেহেতু আগে থেকেই ইয়াসরিবের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তাই প্রথম প্রথম তারা আওস ও খাযরাজ গোত্রকে কর্তৃত্ব চালানোর কোন সুযোগ দেয়নি। তাই এ দু'টি আরব গোত্র অনুর্বর এলাকায় বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয় যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম উপকরণও তারা খুব কষ্টে সংগ্রহ করতে পারতো। অবশেষে তাদের একজন নেতা তাদের স্বগোত্রীয় গাসসানী ভাইদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সিরিয়া গমন করে এবং সেখান থেকে একটি সেনাদল এনে ইহুদীদের শক্তি চূর্ণ করে দেয়। এভাবে আওস ও খাযরাজ ইয়াসরিবের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করে এবং ইহুদীদের দু'টি বড় গোত্র বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা শহরের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তৃতীয় আরেকটি ইহুদী গোত্র বনী কায়নুকার যেহেতু বনু কুরাইযা ও বনু নাজীর গোত্রের সাথে তিক্ত সম্পর্ক ছিল তাই তারা শহরের ভেতরেই থেকে যায়। তবে এখানে থাকার জন্য তাদেরকে খাযরাজ গোত্রের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হয়। এর বিরুদ্ধে বনী নাযীর ও বনী কুরায়যা গোত্রকে আওস গোত্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় নিতে হয় যাতে তারা নিরাপদে ইয়াসরিবের আশেপাশে বসবাস করতে পারে। নীচের মানচিত্র দেখলে স্পষ্ট বুঝা যাবে, এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াসরিব এবং তার আশেপাশে কোথায় কোথায় ইহুদী বসতি ছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের পূর্বে হিজরাতের সূচনাকাল পর্যন্ত সাধারণভাবে গোটা হিজাযের এবং বিশেষভাবে ইয়াসরিবে ইহুদীদের অবস্থা ও পরিচয় মোটামুটি এরূপ ছিল ঃ

www.icsbook.info

হিজরতের পর মদীনায় ইয়াহুদী অবস্থানসমূহ

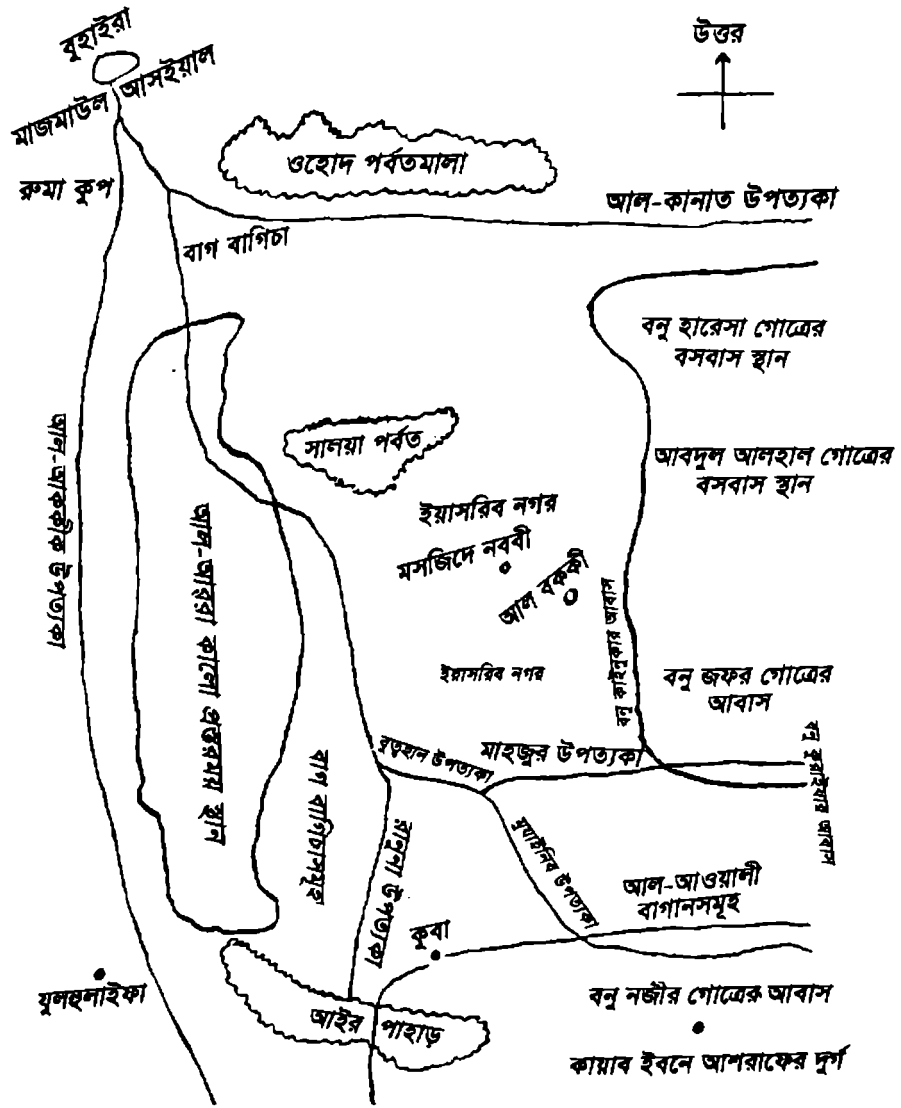

www.icsbook.info

ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, তাহযীব, তামাদ্দুন সবদিক দিয়ে তারা আরবী ভাবধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনকি তাদের অধিকাংশের নামও হয়ে গিয়েছিল আরবী। হিজাযে বসতি স্থাপনকারী ইহুদী গোত্র ছিল বারটি। তাদের মধ্যে একমাত্র বনী যা'য়ুরা ছাড়া আর কোন গোত্রেরই হিব্রু নাম ছিল না। হাতেগোণা কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছাড়া তাদের কেউ-ই হিব্রু ভাষা জানত না। জাহেলী যুগের ইহুদী কবিদের যে কাব্যগাঁথা আমরা দেখতে পাই তার ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিষয়বস্তুতে আরব কবিদের থেকে স্বতন্ত্র এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা তাদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের ও সাধারণ আরবদের মধ্যে ধর্ম ছাড়া আর কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তারা আরবদের মধ্যে একেবারে বিলীনও হয়ে যায়নি। তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেদের ইহুদী জাত্যাভিমান ও পরিচয় টিকিয়ে রেখেছিল। তারা বাহ্যত আরবী ভাবধারা গ্রহণ করেছিল শুধু এ জন্য যে, তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। আরবী ভাবধারা গ্রহণ করার কারণে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা তাদের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে নিয়েছে যে, তারা মূলত বনী ইসরাঈল নয়, বরং ইহুদী ধর্ম গ্রহণকারী আরব কিংবা তাদের অধিকাংশ অন্তত আরব ইহুদী। ইহুদীরা হিজাযে কখনো ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিল অথবা তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ খৃষ্টান পাদ্রী এবং মিশনারীদের মত আরববাসীদের ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান জানাতো এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যে ইসরাঈলিয়াত বা ইহুদীবাদের চরম গোঁড়ামি এবং বংশীয় আভিজাত্যের গর্ব ও অহংকার ছিল। আরবের অধিবাসীদের তারা 'উম্মী' (Gentiles) বলে আখ্যায়িত করত যার অর্থ শুধু নিরক্ষরই নয়, বরং অসভ্য এবং মূর্খও। তারা বিশ্বাস করত, ইসরাঈলীরা যে মানবাধিকার ভোগ করে এরা সে অধিকার লাভেরও উপযুক্ত নয়। বৈধ ও অবৈধ সব রকম পন্থায় তাদের অর্থ-সম্পদ মেরে খাওয়া ইসরাঈলীদের জন্য হালাল ও পবিত্র। নেতৃ পর্যায়ের লোক ছাড়া সাধারণ আরবদের তারা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করে সমান মর্যাদা দেয়ার উপযুক্তই মনে করত না। কোন আরব গোত্র বা বড় কোন আরব পরিবার ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব লোকগাথায় তার কোন হদিসও মেলে না। এমনিতেও ইহুদীদের ধর্মপ্রচারের চেয়ে নিজেদের আর্থিক কায়-কারবারের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল অধিক। তাই একটি ধর্ম হিসেবে হিজাযে ইহুদীবাদের বিস্তার ঘটেনি। বরং তা হয়েছিল কয়েকটি ইহুদী গোত্রের গর্ব ও অহংকারের পুঁজি। তবে ইহুদী ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাবীজ-কবচ, ভাল-মন্দ লক্ষণ নির্ণয় এবং যাদুবিদ্যার রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর এ কারণে আরব সমাজে তাদের 'ইলম' ও 'আমলে'র খ্যাতি ও প্রতাপ বিদ্যমান ছিল।

আরব গোত্রসমূহের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল অধিক মজবুত। তারা যেহেতু ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার অধিক সুসভ্য অঞ্চল থেকে এসেছিল তাই এমন অনেক শিল্প ও কারিগরী তারা জানতো যা আরবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। তাছাড়া বাইরের জগতের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। এসব কারণে ইয়াসরিব এবং হিজাযের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানী আর এখান থেকে খেজুর রপ্তানীর কারবার তাদের হাতে চলে এসেছিল। হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য শিকারেরও বেশীর ভাগ তাদেরই করায়ত্ত ছিল। বস্ত্র উৎপাদনের কাজও তারাই করত। তারাই আবার জায়গায়

www.icsbook.info

জায়গায় পানশালা নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব জায়গা থেকে মদ এনে বিক্রি করা হতো। বনু কায়নুকা গোত্রের অধিকাংশ লোক স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র নির্মাণ পেশায় নিয়োজিত ছিল। এসব কায়কারবারে ইহুদীরা অস্বাভাবিক মুনাফা লুটতো। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় কারবার ছিল সুদী কারবার। আশেপাশের সমস্ত আরবদের তারা এই সুদী কারবারের ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। বিশেষ করে আরব গোত্রসমূহের নেতা ও সরদাররা বেশী করে এই জালে জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ ঋণগ্রহণ করে জাঁকজমকে চলা এবং গর্বিত ভঙ্গিতে জীবনযাপন করার রোগ সবসময়ই তাদের ছিল। এরা অত্যন্ত চড়া হারের সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতো এবং তা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়াতে থাকত। কেউ একবার এই জালে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত। এভাবে তারা আর্থিক দিক দিয়ে আরবদেরকে অন্তসারশূন্য করে ফেলেছিল। তবে তার স্বাভাবিক ফলাফলও দাঁড়িয়েছিল এই যে, তাদের বিরুদ্ধে আরবদের মধ্যে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিল।

—আরবদের মধ্যে কারো বন্ধু হয়ে অন্য কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি না করা এবং পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ না করাই ছিল তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক স্বার্থের অনুকূলে। কিন্তু অন্যদিকে আবার আরবদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়া এবং তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রাখাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূলে। কারণ, তারা জানতো, আরব গোত্রসমূহ যখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে তখন আর তারা সেই সব সহায়-সম্পত্তি, বাগান এবং শস্য-শ্যামল ফসলের মাঠ তাদের অধিকারে থাকতে দেবে না, যা তারা সুদী কারবার ও মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লাভ করেছে। তাছাড়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাদের প্রতিটি গোত্রকে কোন না কোন শক্তিশালী আরব গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হতো যাতে অন্য কোন শক্তিশালী গোত্র তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে। এ কারণে আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে তাদেরকে বারবার শুধু জড়িয়ে পড়তেই হতো না, বরং অনেক সময় একটি ইহুদী গোত্রকে তার মিত্র আরব গোত্রের সাথে মিলে অপর কোন ইহুদী গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হতো, বিরোধী আরব গোত্রের সাথে যাদের থাকতো মিত্রতার সম্পর্ক। ইয়াসরিবে বনী কুরায়যা ও বনী নাযীর ছিল আওস গোত্রের এবং বনী কায়নুকা ছিল খাযরাজ গোত্রের মিত্র। হিজরাতের কিছুকাল পূর্বে 'বু'আস' নামক স্থানে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল তাতে এই ইহুদী গোত্রগুলোও নিজ নিজ বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে মদীনায় ইসলাম পৌঁছে এবং শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহর (সা) আগমনের পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার সাথে সাথে তিনি প্রথম যে কাজগুলো করলেন তার মধ্যে একটি হলো আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃবন্ধন সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, এই মুসলিম সমাজ এবং ইহুদীদের মধ্যে স্পষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এ চুক্তিতে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, একে অপরের অধিকারসমূহে হস্তক্ষেপ করবে না এবং বাইরের শত্রুর মোকাবিলায় সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে।

www.icsbook.info

ইহুদী এবং মুসলমানরা পরস্পরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মেনে চলবে এই চুক্তি থেকে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়। চুক্তির কতকগুলো বিষয় নিম্নরূপ ঃ

ان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة - وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الا ثم - وانه لم يثم امر ؤبحليفه ، وان النصر للمظلوم ، وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربيي ، وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة ..... وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى اللّه عزوجل والى محمد رسول اللّه ..... وانه لاتجار قريش ولا من نصرها ، وان بينهم والنصر على من دهم يثرب - على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم -

(ابن هشام - ج ٢ - ص ١٤٧ - ١٥٠)

ইয়াহুদীরা নিজেদের ব্যয় বহন করবে এবং মুসলমানরাও নিজেদের ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তির পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধ করলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে তারা একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের পরস্পরের সম্পর্ক হবে কল্যাণ করা ও অধিকার পৌঁছিয়ে দেয়ার সম্পর্কে গোনাহ ও সীমালংঘনের সম্পর্ক নয়।

কেউ তার মিত্রশক্তির সাথে কোনপ্রকার খারাপ আচরণ করবে না।

মজলুম ও নির্যাতিতদের সাহায্য করা হবে।

যতদিন যুদ্ধ চলবে ইহুদীরা ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে তার ব্যয় বহন করবে।

এই চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলোর জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কোনপ্রকার ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

এই চুক্তির শরীক পক্ষগুলোর মধ্যে যদি এমন কোন ঝগড়া-বিবাদ ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় যার কারণে বিপর্যয় সৃষ্টির আশংকা দেখা দিতে পারে তাহলে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বিধান অনুসারে তার মীমাংসা করবেন। .....

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র ও সাহায্যকারীদের আশ্রয় দেয়া হবে না।

www.icsbook.info

কেউ ইয়াসরিবের ওপর আক্রমণ করলে চুক্তির শরীকগণ তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য করবে। প্রত্যেকপক্ষ নিজ নিজ এলাকার প্রতিরক্ষার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। (ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৭ থেকে ১৫০ পর্যন্ত)

এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট ও অলংঘনীয় চূড়ান্ত চুক্তি। ইহুদীরা নিজেরাই এর শর্তাবলী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণ করতে শুরু করল। তাদের এই শত্রুতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। এর বড় বড় কারণ ছিল তিনটি ঃ

এক ঃ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাতির একজন নেতা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিল যিনি তাদের সাথে শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবেন এবং নিজের দলের পার্থিব স্বার্থের সাথে কেবল তার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু তারা দেখলো, তিনি আল্লাহ, আখেরাত, রিসালাত এবং কিতাবের প্রতিও ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছেন (যার মধ্যে তাদের নিজেদের রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও অন্তরভুক্ত) এবং গোনাহর কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং নৈতিক সীমা ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে আহবান জানাচ্ছেন, খোদ তাদের নবী-রসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে যে আহবান জানাতেন। এসব ছিল তাদের কাছে অপছন্দনীয়। তারা আশংকাবোধ করলো, যদি এই বিশ্বজনীন আদর্শিক আন্দোলন চলতেই থাকে তাহলে তার সয়লাবের মুখে তাদের স্থূল ও অচল ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শন এবং বংশ ও গোষ্ঠীগত জাতীয়তা খড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

দুই ঃ আওস, খাযরাজ এবং মুহাজিরদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে এবং আশেপাশের আরব গোত্রসমূহের যারাই ইসলামের এই আহবানে সাড়া দিচ্ছে তারাই মদীনার এই ইসলামী ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে তারা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলো যে, নিজেদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে স্বার্থোদ্ধার করার যে নীতি তারা শত শত বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে নতুন এই ব্যবস্থাধীনে তা আর চলবে না, বরং এখন তাদেরকে আরবের একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করতে হবে। যেখানে এই অপকৌশল আর সফল হবে না।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ ও সভ্যতার যে সংস্কার করছিলেন তাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকম অবৈধ পথ ও পন্থা নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও অন্তরভুক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাপার হলো, সুদভিত্তিক কারবারকেও তিনি নাপাক উপার্জন এবং হারাম খাওয়া বলে ঘোষণা করছিলেন। এ কারণে তারা আশংকা করছিল যে, আরব জনগণের ওপর যদি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব কায়েম হয় তাহলে তিনি আইনগতভাবে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন। একে তারা নিজেদের মৃত্যুর শামিল বলে মনে করছিল।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করা তারা নিজেদের জাতীয় লক্ষ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিল। তাঁকে আঘাত দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন অপকৌশল, ষড়যন্ত্র ও উপায় অবলম্বন করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হতো না। সাধারণ

www.icsbook.info

মানুষ যাতে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে সে জন্য তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের মনে সব রকমের সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতো। যাতে তারা এ দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যত বেশী পারা যায় ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য নিজেরাও মিথ্যামিথ্যি ইসলাম গ্রহণ করতো এবং তারপর আবার মুরতাদ বা ইসলাম ত্যাগী হয়ে যতো। অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুনাফিকদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতো। ইসলামের শত্রু প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং তাদেরকে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতো। তাদের বিশেষ লক্ষ ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন। দীর্ঘদিন যাবত এ দু'টি গোত্রের সাথে তাদের সুসম্পর্ক ছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বারবার 'বু'আস' যুদ্ধের আলোচনা তুলে তাদেরকে পূর্ব শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। যাতে আরেকবার তাদের মধ্যে তরবারির ঝনঝনানি শুরু হয়ে যায় এবং ইসলাম তাদেরকে যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো তা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মুসলমানদের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করার জন্যও তারা নানারূপ জালিয়াতি করতো। যাদের সাথে আগে থেকেই তাদের লেনদেন ছিল তাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো তারা তার ক্ষতিসাধন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতো। তার কাছে যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তাকে উত্যক্ত ও বিব্রত করে তুলতো। তবে তার যদি কিছু পাওনা থাকতো তাহলে তা আত্মসাৎ করতো। তারা প্রকাশ্যে বলতো ঃ আমরা তোমার সাথে যখন লেনদেন ও কারবার করেছিলাম তখন তোমার ধর্ম ছিল অন্যকিছু। এখন যেহেতু তুমি তোমার ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলেছো তাই আমাদের কাছে তোমার কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট নেই। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নায়শাবুরী. তাফসীরে তাবরাসী এবং তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে সূরা আলে ইমরানের ৭৫নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এর বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

চুক্তির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই শত্রুতামূলক আচরণ তারা বদর যুদ্ধের আগে থেকেই করতে শুধু করেছিলো। কিন্তু বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কুরাইশদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করলে তারা অস্থির হয়ে ওঠে এবং তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হয়। তারা আশা করেছিলো, এই যুদ্ধে কুরাইশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলামের এই বিজয়ের খবর পৌছার পূর্বেই তারা মদীনায় গুজব ছড়াতে শুরু করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন, মুসলমানদের চরম পরাজয় ঘটেছে এবং আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশ বাহিনী মদীনার দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু ফলাফল তাদের আশা আকাংখার সম্পূর্ণ বিপরীত হলে তারা রাগে ও দুঃখে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। বনী নাযীর গোত্রের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ চিৎকার করে বলতে শুরু করলোঃ খোদার শপথ, মুহাম্মাদ যদি আরবের এসব সম্মানিত নেতাদের হত্যা করে থাকে তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই আমাদের জন্য অধিক উত্তম। এরপর সে মক্কায় গিয়ে হাজির হলো এবং বদর যুদ্ধে যেসব কুরাইশ নেতা নিহত হয়েছিলো তাদের নামে অত্যন্ত উত্তেজনাকর শোকগাঁথা শুনিয়ে শুনিয়ে মক্কাবাসীদের

www.icsbook.info

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করতে থাকলো। এরপর সে মদীনায় ফিরে আসলো এবং নিজের মনের ঝাল মিটানোর জন্য এমন সব কবিতা ও গান গেয়ে শুনাতে শুরু করলো যাতে সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকতো। তার এই ঔদ্ধত্য ও বখাটেপনায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নবী (সা) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারীকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করাতে বাধ্য হলেন। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদীদের যে গোত্রটি সমষ্টিগতভাবে সর্বপ্রথম খোলাখুলি চুক্তিভংগ করেছিল সেটি ছিল বনু কায়নুকা গোত্র। এরা মদীনার শহরাভ্যন্তরে একটি মহল্লায় বাস করতো। যেহেতু তারা স্বর্ণকার, কর্মকার ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিল, তাই মদীনাবাসীদের তাদের বাজারে বেশী বেশী যাতায়াত করতে হতো। নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে তারা গর্ববোধ করতো। কর্মকার হওয়ার কারণে তাদের প্রতিটি বাচ্চা পর্যন্ত অস্ত্র সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল সাত শত যুদ্ধোপযোগী পুরুষ। খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতা সম্পর্ক ছিল। আর খাযরাজ গোত্রের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উবাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেও তাদের অহমিকা ছিল। বদর যুদ্ধের ঘটনায় তারা এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তারা তাদের বাজারে যাতায়াতকারী মুসলমানদের বিব্রত করা ও কষ্ট দেয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের উত্যক্ত করতে শুরু করেছিলো। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাদের বাজারে একদিন একজন মুসলমান মহিলাকে সবার সামনে উলঙ্গ করে ফেলা হলে তা নিয়ে মারাত্মক ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং হাংগামায় একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী নিহত হয়। পরিস্থিতি এতদূর গড়ালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মহল্লায় গেলেন এবং তাদের সবাইকে ডেকে একত্রিত করে ন্যায় ও সততার পথ অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তারা বললো ঃ "মুহাম্মাদ, সম্ভবত তুমি আমাদেরকেও কুরাইশ মনে করেছো? যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল অনভিজ্ঞ। তাই তুমি তাদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছো। কিন্তু আমাদের সাথে পালা পড়লে জানতে পারবে পুরুষলোক কাকে বলে।" এটা ছিল স্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। অবশেষে নবী (সা) দুই হিজরীর শাওয়াল (অপর এক বর্ণনা অনুসারে যিলকা'দা) মাসের শেষ দিকে তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। মাত্র পনের দিন অবরোধ চলার পরই তারা আত্মসমর্পণ করলো এবং তাদের যুদ্ধক্ষম সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের সাহায্য সমর্থনে এগিয়ে আসলো। নবী (সা) যেন তাদের ক্ষমা করে দেন এ জন্য সে বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলো। নবী (সা) তার আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, বনু কায়নুকা তাদের অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং শিল্প-সরঞ্জাম রেখে মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। (ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, তারীখে তাবারী)।

এ দু'টি চরম পদক্ষেপ (অর্থাৎ বনী কায়নুকার বহিষ্কার এবং কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা) গ্রহণ করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত ইহুদীরা এতটা ভীত সন্ত্রস্ত রইলো যে, আর কোন দুষ্কর্ম করার সাহস তাদের হলো না। কিন্তু হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসলে ইহুদীরা দেখলো, কুরাইশদের তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মাত্র এক হাজার

www.icsbook.info

লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়েছে এবং তাদের মধ্যে থেকেও তিন শত মুনাফিক দলত্যাগ করে ফিরে এসেছে। তখন তারা প্রথমবারের মত স্পষ্টভাবে চুক্তিলংঘন করে বসলো। অর্থাৎ মদীনার প্রতিরক্ষায় তারা নবীর (সা) সাথে শরীক হলো না। অথচ চুক্তি অনুসারে তারা তা করতে বাধ্য ছিল। এরপর উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের সাহস আরো বেড়ে গেল। এমন কি রসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার জন্য বনী নাযীর গোত্র একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। কিন্তু ঠিক বাস্তবায়নের মুখে তা বানচাল হয়ে গেল। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, 'বিরে মা'য়ুনা'র মর্মান্তিক ঘটনার (৪র্থ হিজরীর সফর মাস) পর আমর ইবনে উমাইয়া দামরী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভুলক্রমে বনী আমের গোত্রের দু'জন লোককে হত্যা করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিলো চুক্তিবদ্ধ গোত্রের লোক। 'আমর তাদেরকে শত্রু গোত্রের লোক মনে করেছিল। এ ভুলের কারণে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপণ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনী নাযীর গোত্রও শরীক ছিল, তাই রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহবান জানাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজে তাদের এলাকায় গেলেন। সেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু খোশগল্পে ব্যস্ত রেখে ষড়যন্ত্র আঁটলো যে, তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর ওপর একখানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তা'আলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরায়যা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তাই তোমরা রুখে দাঁড়াও, নিজেদের জায়গা পরিত্যাগ করো না। এ মিথ্যা আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরমপত্রের জবাবে তারা জানিয়ে দিল যে, আমরা এখান থেকে চলে যাব না। আপনার কিছু করার থাকলে করে দেখতে পারেন। এতে ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। অবরোধের মাত্র ক'দিন পরই (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র ছয় দিন এবং কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনর দিন) তারা এই শর্তে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য সব জিনিস নিজেদের উটের পিঠে চাপিয়ে যতটা সম্ভব নিয়ে যাবে। এভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় এই পাপী গোত্র থেকে মদীনাকে মুক্ত করা হলো। তাদের মধ্য থেকে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল এবং অন্যরা সবাই সিরিয়া ও খায়বার এলাকার দিকে চলে গেল।

এ ঘটনা সম্পর্কেই এ সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

www.icsbook.info

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনী নাযীর যুদ্ধের পর্যালোচনাই এ সূরার বিষয়বস্তু। এতে মোটামুটি চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) প্রথম চারটি আয়াতে গোটা দুনিয়াবাসীকে সেই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে বনী নাযীর গোত্র সবেমাত্র যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। একটি বৃহত গোত্র যার জনসংখ্যা সে সময় মুসলমানদের জনসংখ্যার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থ–সম্পদে যারা মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, যাদের কাছে যুদ্ধের সাজ–সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না এবং যাদের দুর্গসমূহও ছিল অত্যন্ত মজবুত, মাত্র কয়েকদিনের অবরোধের মুখে তারা টিকে থাকতে পারলো না এবং কোন একজন মানুষ নিহত হওয়ার মত পরিস্থিতিরও উদ্ভব হলো না। তারা শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা তাদের আপন জনপদ ছেড়ে দেশান্তরিত হতে রাজি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা মুসলমানদের শক্তির দাপটে হয়নি। বরং তারা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ ফল। আর যারা আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার দুঃসাহস দেখায় তারা এ ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হয়।

(২) ৫নং আয়াতে যুদ্ধের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। নীতিটি হলো, শত্রুদের এলাকার অভ্যন্তরে সামরিক প্রয়োজনে যে ধংসাত্মক কাজকর্ম করতে হয় তা ফাসাদ ফিল আরদ অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির সমার্থক নয়।

(৩) যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে যেসব ভূমি ও সম্পদ ইসলামী সরকারের হস্তগত হয় তার বন্দোবস্ত কিভাবে করতে হবে ৬ থেকে ১০নং আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ সময়ই প্রথমবারের মত একটি বিজিত অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে এসেছিলো, সে জন্য এখানে তার আইন–বিধান বলে দেয়া হয়েছে।

(৪) বনী নাযীর যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে আচরণ ও নীতিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল ১১ থেকে ১৭ আয়াতে তার পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের এই আচরণ ও নীতিভঙ্গির মূলে যেসব কারণ কার্যকর ছিল তাও দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫) শেষ রুকূ'র পুরোটাই উপদেশবাণী। ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হলেও যাদের মধ্যে ঈমানের প্রাণসত্তা নেই তাদের লক্ষ করেই এই উপদেশবাণী। এতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, ঈমানের মূল দাবী কি, তাকওয়া ও পাপাচারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কি, যে কুরআনকে মানার দাবী তারা করছে তার গুরুত্ব কতটুকু এবং যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার স্বীকৃতি তারা দিচ্ছে সেই আল্লাহ কি কি গুণাবলীর অধিকারী?

www.icsbook.info

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ
النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

হে[২৮] ঈমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।[২৯] আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।[৩০] তারাই ফাসেক। যারা দোযখে যাবে এবং যারা জান্নাতে যাবে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতে যাবে তারাই সফলকাম।

(আমি তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি তো আল্লাহকে ভয় পাই।)

২৮. কুরআন মজীদের নিয়ম হলো, যখনই মুনাফিক মুসলমানদের মুনাফিকসুলভ আচরণের সমালোচনা করা হয় তখনই তাদেরকে নসীহতও করা হয়। যাতে তাদের যার যার মধ্যে এখনো কিছুটা বিবেক অবশিষ্ট আছে সে যেন তার এই আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে ধ্বংসের সেই গহবর থেকে উঠে আসার চিন্তা করে যার মধ্যে সে প্রকৃতির দাসত্বের কারণে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ রুকূ' পুরোটাই এ ধরনের নসীহতে পরিপূর্ণ।

২৯. আগামীকাল অর্থ আখেরাত। দুনিয়ার এই গোটা জীবনকাল হলো 'আজ' এবং কিয়ামতের দিন হলো আগামীকাল যার আগমন ঘটবে আজকের এই দিনটির পরে। এ ধরনের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, ক্ষণস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি তার সবকিছু ব্যয় করে ফেলে এবং কাল তার কাছে ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই থাকবে কিনা সে কথা চিন্তা করে না সেই ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বড় নির্বোধ। ঠিক তেমনি ঐ ব্যক্তিও নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে যে তার পার্থিব জীবন নির্মাণের চিন্তায় এতই বিভোর যে আখেরাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল হয়ে গিয়েছে। অথচ আজকের দিনটির পরে কালকের দিনটি যেমন অবশ্যই আসবে তেমনি আখেরাতও আসবে। আর দুনিয়ার বর্তমান জীবনে যদি সে সেখানকার জন্য অগ্রিম কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সেখানে কিছুই

www.icsbook.info

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ
لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾

আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে পেতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।[৩১] আমি মানুষের সামনে এসব উদাহরণ এ জন্য পেশ করি যাতে তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) ভেবে দেখে।

আল্লাহই সেই[৩২] মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।[৩৩] অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন।[৩৪] তিনিই রহমান ও রহীম।[৩৫]

পাবে না। এর সাথে দ্বিতীয় জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এ আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের হিসাব পরীক্ষক বানানো হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ সে অনুভব করতে পারে না যে, সে যা কিছু করছে তা তার আখেরাতের জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করছে, না ধ্বংস করছে। তার মধ্যে এই অনুভূতি যখন সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তখন তার নিজেকেই হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে, সে তার সময়, সম্পদ, শ্রম, যোগ্যতা এবং প্রচেষ্টা যে পথে ব্যয় করছে তা তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনা করা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। অন্যথায় সে নিজের ভবিষ্যত নিজেই ধ্বংস করবে।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া, সে কার বান্দা সে কথা যখন কেউ ভুলে যায়, তখন অনিবার্যরূপে সে দুনিয়ায় তার একটা ভুল অবস্থান ঠিক করে নেয়। এই মৌলিক ভ্রান্তির কারণে তার গোটা জীবনই ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে সে যখন একথা ভুলে যায় যে, সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দা নয় তখন আর সে শুধু সেই এদের বন্দেগী করে না। এমতাবস্থায় সে প্রকৃতই যার বান্দা তাকে বাদ দিয়ে যাদের সে বান্দা নয় এমন অনেকের বন্দেগী করতে থাকে। এটা আর একটা মারাত্মক ও সর্বাত্মক ভুল যা তার গোটা জীবনকেই ভুলে পরিণত করে। পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান হলো সে বান্দা বা দাস, স্বাধীন বা মুক্ত নয়। সে কেবল এক আল্লাহর বান্দা, তার ছাড়া আর কোরো বান্দা সে নয়। একথাটি যে ব্যক্তি জানে না প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজেকে জানে না। আর যে ব্যক্তি একথাটি জেনেও এক মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যায় সেই মুহূর্তে সে এমন কোন কাজ করে বসতে পারে যা কোন আল্লাহদ্রোহী বা মুশরিক অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত মানুষই করতে পারে। সঠিক পথের ওপর মানুষের টিকে থাকা পুরোপুরি নির্ভর করে আল্লাহকে স্মরণ করার ওপর। আল্লাহ

www.icsbook.info

তা'আলা সম্পর্কে গাফেল হওয়া মাত্রই সে নিজের সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যায় আর এই গাফিলতিই তাকে ফাসেক বানিয়ে দেয়।

৩১. এই উপমার তাৎপর্য হলো, কুরআন যেভাবে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর কাছে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে পাহাড়ের মত বিশাল সৃষ্টিও যদি তার উপলব্ধি লাভ করতে পারতো এবং কেমন পরাক্রমশালী ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর সামনে নিজের সব কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে তা যদি জানতো তাহলে সেও ভয়ে কেঁপে উঠতো। কিন্তু যে মানুষ কুরআনকে বুঝতে পারে এবং কুরআনের সাহায্যে সবকিছুর তাৎপর্য ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে, কিন্তু এরপরও তার মনে কোন ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয় না কিংবা যে কঠিন দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়েছে সে সম্পর্কে তার আল্লাহকে কি জবাব দেবে সে বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা তার মনে জাগে না। বরং কুরআন পড়ার বা শোনার পরও সে এমন নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রীয় থাকে যেন একটি নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন পাথর। শোনা, দেখা ও উপলব্ধি করা আদৌ তার কাজ নয়। মানুষের এই চেতনাহীনতা ও নিরুদ্বিগ্নতা বিস্ময়কর বৈকি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ১২০)।

৩২. এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে, যিনি তোমার ওপর এসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং যাঁর কাছে অবশেষে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে সেই আল্লাহ কেমন এবং তাঁর গুণাবলী কি? উপরোল্লেখিত বিষয়টি বর্ণনার পর পরই আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তার লেনদেন ও বুঝা পড়া কোন সাধারণ সত্তার সাথে নয়, বরং এমন এক জবরদস্ত সত্তার সাথে যিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী। এখানে এ বিষয়টি জেনে নেয়া দরকার যে, যদিও কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর গুণাবলী এমন অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যা থেকে আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিন্তু দু'টি স্থান বিশেষভাবে এমন যেখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বর্ণনা পাওয়া যায়। এর একটি হলো, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী (২৫৫ আয়াত) অপরটি হলো সূরা হাশরের এই আয়াতগুলো।

৩৩. অর্থাৎ যিনি ছাড়া আর কারোই ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থান এমন নয় যে, তার বন্দেগী ও আরাধনা করা যেতে পারে। যিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিকই নয় যে, সে উপাস্য হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ সৃষ্টির কাছে যা গোপন ও অজানা তিনি তাও জানেন আর যা তাদের কাছে প্রকাশ্য ও জানা তাও তিনি জানেন। এই বিশ্ব-জাহানের কোন বস্তুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। যা অতীত হয়ে গিয়েছে, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছুই তিনি সরাসরি জানেন। এসব জানার জন্য তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন।

৩৫. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই এমন এক সত্তা যার রহমত অসীম ও অফুরন্ত। সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী পরিব্যপ্ত এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসই তাঁর বদান্যতা ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। গোটা বিশ্ব-জাহানে আর একজনও এই সর্বাত্মক ও অফুরন্ত রহমতের অধিকারী নেই। আর যেসব সত্তার মধ্যে দয়ামায়ার এই গুণটি দেখা যায় তা আংশিক ও

www.icsbook.info

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

আল্লাহ-ই সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি বাদশাহ,[৩৬] অতীব পবিত্র,[৩৭] পূর্ণাঙ্গ শান্তি,[৩৮] নিরাপত্তাদানকারী,[৩৯] হিফাযতকারী,[৪০] সবার ওপর বিজয়ী,[৪১] শক্তি বলে নিজের নির্দেশ কার্যকরী করতে সক্ষম।[৪২] এবং সবার চেয়ে বড় হয়েই বিরাজমান থাকতে সক্ষম।[৪৩] আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে পবিত্র যা লোকেরা করে থাকে।[৪৪] সেই পরম সত্তা তো আল্লাহ-ই যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দানকারী এবং সেই অনুপাতে রূপদানকারী।[৪৫] উত্তম নামসমূহ তাঁর-ই।[৪৬] আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করে চলেছে।[৪৭] তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।[৪৮]

সীমিত। তাও আবার তার নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট নয়। বরং স্রষ্টা কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সামনে রেখে তা তাকে দান করেছেন তিনি কোন সৃষ্টির মধ্যে দয়ামায়ার আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকলে তা এ জন্য করেছেন যে, তিনি একটি সৃষ্টিকে দিয়ে আরেকটি সৃষ্টির প্রতিপালন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে চান। এটাও তাঁরই রহমতের প্রমাণ।

৩৬. মূল আয়াতে الملك শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ প্রকৃত বাদশাহ তিনিই। তাছাড়া শুধু الملك শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশাহ নন, বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতিটি বস্তুর তিনিই মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা সার্বভৌম ক্ষমতাকে (Soverignty) সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীর এ দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ - (الروم : ٢٦)

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত।" (আর রাম-২৬)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۗءِ اِلَى الْاَرْضِ - (السجده : ٥)

www.icsbook.info

"আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সব কাজের ব্যবস্থাপনা তিনিই পরিচালনা করে থাকেন।"

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ – (الحديد : ٥)

"আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। সব বিষয় আল্লাহর দিকেই রুজু করা হবে।"

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ– (الفرقان : ٢)

"বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়।"

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ– (يس : ٨٢)

"সবকিছুর কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা তাঁরই হাতে।" (ইয়াসীন-৮২)

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ – (البروج : ١٦)

"যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম" (আল বুরুজ-১৬)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ – (الانبياء : ٢٣)

"তিনি যা করেন তার জন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তবে অন্য সবাইকে জবাবদিহি করতে হয়।"

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ – (الرعد : ٤١)

"আল্লাহ ফায়সালা করেন। তাঁর ফায়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই।"

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ – (المؤمنون : ٨٨)

"তিনিই আশ্রয় দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

(আল মু'মিনূন, ৮৮)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ – (ال عمران : ٢٦)

"বলো, হে আল্লাহ, বিশ্ব-জাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করো আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর। সমস্ত কল্যাণ তোমার আয়ত্বে। নিসন্দেহে তুমি সব বিষয়ে শক্তিমান।" (আলে ইমরান, ২৬)

এসব স্পষ্ট ঘোষণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বাদশাহী সার্বভৌমত্ব কোন সীমিত বা রূপক অর্থের বাদশাহী নয়, বরং সত্যিকার বাদশাহী যা

www.icsbook.info

সার্বভৌমত্বের পূর্ণাংগ অর্থ ও পূর্ণাংগ ধারণার মূর্তপ্রতীক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার বাদশাহীতেই আছে। তাঁকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, যার প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গণ্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না।

কিন্তু কুরআন মজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্ব-জাহানের বাদশাহ। এর সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি 'কুদ্দুস,' 'সালাম,' 'মু'মিন', 'মুহাইমিন', 'আযীয', 'জাব্বার', 'মুতাকাব্বির,' 'খালেক', 'বারী' এবং 'মুছাওবির'।

৩৭. মূল ইবারতে قدوس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قدس । قدس অর্থ সবরকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। قدوس অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা কোন পকার দোষ-ত্রুটি অথবা অপূর্ণতা কিংবা কোন মন্দ বৈশিষ্টের অনেক উর্ধ্বে। বরং তা এক অতি পবিত্র সত্তা যার মন্দ হওয়ার ধারণাও করা যায় না। এখানে একথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, চরম পবিত্রতা প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের প্রাথমিক অপরিহার্য বিষয়সমূহের অন্তরভুক্ত যে সত্তা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র এবং বদনিয়াত পোষণকারী, যার মধ্যে মানব চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্টসমূহ বিদ্যমান এবং যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে অধিনস্তরা কল্যাণ লাভের প্রত্যাশী হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে এমন সত্তা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে এটা মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কারণে মানুষ যাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলে স্বীকৃতি দেয় তার মধ্যে পবিত্রতা না থাকলেও তা আছে বলে ধরে নেয়। কারণ পবিত্রতা ছাড়া নিরংকুশ ক্ষমতা অকল্পনীয়। কিন্তু এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহ ছাড়া কোন চূড়ান্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি পবিত্র নয় এবং তা হতেও পারে না। ব্যক্তিগত বাদশাহী, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি, অন্য কোন পদ্ধতির মানবীয় সরকার যাই হোক না কেন কোন অবস্থায়ই তার সম্পর্কে চরম পবিত্রতার ধারণা করা যেতে পারে না।

৩৮. মূল আয়াতে السلام শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ শান্তি। কাউকে 'সুস্থ' ও 'নিরাপদ' না বলে 'নিরাপত্তা' বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপাদমস্তক সৌন্দর্যমণ্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তি । কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

www.icsbook.info

৩৯. মূল আয়াতে المؤمن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির মূল ধাতু হলো امن । امن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মু'মিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাঁকে মু'মিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তাঁর সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু المؤمن বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব-জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা।

৪০. মূল আয়াতে اَلْمُهَيْمِنُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির তিনটি অর্থ হয়। এক, তত্ত্বাবধান ও হিফাজতকারী। দুই, পর্যবেক্ষণকারী, কে কি করছে তা যিনি দেখছেন। তিন, সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপক, যিনি মানুষের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখানেও যেহেতু শুধু المهيمن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কর্তার কোন কর্ম নির্দেশ করা হয়নি। অর্থাৎ তিনি কার তত্ত্বাবধানকারী ও সংরক্ষক, কার পর্যবেক্ষক এবং কার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়নি। তাই শব্দের এ ধরনের প্রয়োগ থেকে স্বতঃই যা অর্থ দাঁড়ায় তা হলো তিনি সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করছেন, সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্ব-জাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

৪১. মূল ইবারতে العزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যার মোকাবিলায় অন্য কেউ মাথা তুলতে পারে না, যার সিদ্ধান্তসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর সাধ্য কারো নেই এবং যার মোকাবিলায় সবাই অসহায় ও শক্তিহীন।

৪২. মূল আয়াতে الجبار শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শব্দমূল বা ধাতু হলো جبر । جبر শব্দের অর্থ কোন বস্তুকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঠিক করা, কোন জিনিসকে শক্তি দ্বারা সংশোধন করা। যদিও আরবী ভাষায় جبر শব্দটির কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু সংশোধন অর্থে এবং কোন কোন সময় শুধু জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হলো, সংস্কার ও সংশোধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে جبار (জাব্বার) বলার অর্থ হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সৃষ্ট বিশ্ব-জাহানের শৃংখলা রক্ষাকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নকারী, যদিও তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়াও جبار শব্দটির মধ্যে বড়ত্ব ও মহত্ববোধক অর্থও বিদ্যমান। খেজুরের যে গাছ অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে তার ফল সংগ্রহ করা কারো জন্য সহজসাধ্য নয় আরবী ভাষায় তাকে জাব্বার বলে। অনুরূপ যে কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও জাকজমকপূর্ণ তাকে জাব্বার বা অতি বড় কাজ বলা হয়।

৪৩. মূল আয়াতে اَلْمُتَكَبِّرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, যে প্রকৃতপক্ষে বড় নয়, কিন্তু খামাখা বড়ত্ব জাহির করে। দুই, যে প্রকৃতপক্ষেই বড় এবং বড় হয়েই থাকে। মানুষ হোক, শয়তান হোক বা অন্য কোন মাখলুক হোক, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তার কোন বড়ত্ব মহত্ব নেই, তাই নিজেকে নিজে বড় মনে করা এবং

www.icsbook.info

অন্যদের কাছে নিজের বড়ত্ব ও মহত্ব জাহির করা একটা মিথ্যা দাবী ও জঘন্য দোষ। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতই বড়, বড়ত্ব বাস্তবে তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট এবং বিশ্ব–জাহানের সব বস্তু তাঁর সামনে ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাই তাঁর বড় হওয়া এবং বড় হয়ে থাকা নিছক কোন দাবী বা ভান নয়। বরং একটি বাস্তবতা। এটি কোন খারাপ বা মন্দ বৈশিষ্ট নয়, বরং একটি গুণ ও সৌন্দর্য যা তাঁর ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই।

৪৪. অর্থাৎ যারাই তাঁর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও গুণাবলীতে কিংবা তাঁর সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারা অতিবড় এক মিথ্যা বলছে। কোন অর্থেই কেউ আল্লাহ তা'আলার শরীক বা অংশীদার নয়। তিনি তা থেকে পবিত্র।

৪৫. অর্থাৎ সারা দুনিয়ার এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তার নির্দিষ্ট আকার আকৃতিতে অস্তিত্ব লাভ করা পর্যন্ত পুরাপুরি তাঁরই তৈরী ও লালিতপালিত। কোন কিছুই আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি অথবা তার নির্মাণ ও পরিপাটি করণে অন্য কারো সামান্যতম অবদানও নেই। এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্মকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় বা স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রথম পর্যায়টি হলো সৃষ্টি অর্থাৎ পরিকল্পনা করা। এর উদাহরণ হলো, কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন ইমারত নির্মাণের পূর্বে যেমন মনে মনে স্থির করে যে, অমুক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে এরূপ ও এরূপ একটি ইমারত নির্মাণ করতে হবে। সে তখন মনে মনে তার নমুনা বা ডিজাইন (Design) চিন্তা করতে থকে। এ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ইমারতের বিস্তারিত ও সামগ্রিক কাঠামো কি হবে এ পর্যায়ে সে তা ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো بَرْء । এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো পৃথক করা, চিরে ফেলা, ফেড়ে আলাদা করা। স্রষ্টার জন্য 'বারী' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাঠামোকে বাস্তবে রূপ দেন। অর্থাৎ যে নকশা তিনি নিজে চিন্তা করে রেখেছেন তাকে কল্পনা বা অস্তিত্বহীনতার জগত থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেন। এর উদাহরণ হলো, ইঞ্জিনিয়ার ইমারতের যে কাঠামো ও আকৃতি তাঁর চিন্তার জগতে অংকন করেছিলেন সে অনুযায়ী ঠিকমত মাপজোঁক করে মাটিতে দাগ টানেন, ভিত খনন করেন, প্রাচীর গেঁথে তোলেন এবং নির্মাণের সকল বাস্তব স্তর অতিক্রম করেন। তৃতীয় পর্যায় হলো, 'তাসবীর'–এর অর্থ রূপদান করা। এখানে এর অর্থ হলো, কোন বস্তুকে চূড়ান্ত, পূর্ণাঙ্গ আকৃতি ও রূপ দান করা। এই তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার কাজ ও মানুষের কাজের মধ্যে আদৌ কোন মিল বা তুলনা হয় না। মানুষের কোন পরিকল্পনাই এমন নয় যা পূর্বের কোন নমুনা থেকে গৃহীত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি পরিকল্পনা অনুপম এবং তাঁর নিজের আবিষ্কার। মানুষ যা তৈরী করে তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট উপাদানসমূহের একটিকে আরেকটির সাথে জুড়ে করে। অস্তিত্ব নেই এমন কোন জিনিসকে সে অস্তিত্ব দান করে না, বরং যা আছে তাকেই বিভিন্ন পন্থায় জোড়া দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যে উপাদান দিয়ে তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে উপাদানও তাঁর নিজের সৃষ্টি। অনুরূপ আকার–আকৃতি দানের ব্যাপারেও মানুষ আবিষ্কর্তা নয়, বরং আল্লাহর তৈরী আকার–আকৃতি ও চিত্রসমূহের অনুকরণকারী ও অপরিপক্ক নকলকারী। প্রকৃত আকার–আকৃতি দানকারী ও চিত্র অংকনকারী মহান আল্লাহ। তিনি প্রতিটি জাতি,

www.icsbook.info

প্রজাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তির অনুপম ও নজীরহীন আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং কোন সময় একই আকার-আকৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাননি।

৪৬. নামসমূহ অর্থ গুণবাচক নাম। তাঁর উত্তম নাম থাকার অর্থ হলো, যেমন গুণবাচক নাম দ্বারা তার কোন প্রকার অপূর্ণতা প্রকাশ পায় যেসব গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নাম তাঁর পূর্ণাংগ গুণ ও বৈশিষ্ট প্রকাশ করে সেই সব নামে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আ'আলার এসব উত্তম নামের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতিসহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন্য কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে।

৪৭. অর্থাৎ মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র।

৪৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা হাদীদের ২নং টীকা।

---

www.icsbook.info